OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 485 - 496
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কালিদাসের শকুন্তলা-ছায়াপটে নবরূপায়িত আধুনিক বাংলা সাহিত্য : অনুভব ও অভিনবত্ব

সমীপেষু দাস
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
বঙ্গবাসী ইভিনিং কলেজ
Email ID : sam.1992.july@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Kālidāsa, Śakuntalā, Adaptation, Modern Bengali Literature, Inspiration, Reinterpretation, Rajsekhar Basu, Selim-Al-Din, Women's Empowerment.

Abstract

Kālidāsa's timeless masterpiece, Abhijñānaśākuntalam, has inspired numerous adaptations and reinterpretations in modern Bengali literature. Authors like Michael Madhusdin Dutt, Saradindu Bandyopadhyay, Rajsekhar Basu, and Selim-Al-Din have woven their own narratives around the classic tale.

Sharadindu Bandyopadhyay's 'Bahni-patanga' (Byomkesh Series) is a notable example. Although the story has a unique plot, the characters of Shakuntala and Inspector Ratikanta mirror the intense romance and all-consuming passion of Kālidāsa's protagonists Śakuntalā and Duṣyanta.

Rajsekhar Basu's 'Bharater Jhumjhumi' incorporates contemporary themes, allegorically depicting the 1947 Partition of India through the toy 'jhumjhumi' hidden by Durvasā Muni.

Selim-Al-Din's play 'Shakuntala' not only adapts Kālidāsa's narrative but also explores the protagonist's struggles in the hermitage of Maharṣi kaṇva. As the daughter of an apsara, Śakuntalā faces societal contempt, highlighting the need for women's empowerment and respect.

These works demonstrate Kālidāsa's ancient masterpiece remains relevant in modern society, offering fresh perspectives and insights. The timeless themes and emotions woven into Abhijñānaśākuntalam continue to inspire new generations of writers and artists, ensuring the classic tale's enduring influence on literature and art.

Through these adaptations and reinterpretations, Kālidāsa's work proves its ability to transcend time and cultural boundaries, speaking to universal human experiences and emotions. As a result, Abhijñānaśākuntalam remains an integral part of India's rich literary heritage, continuing to inspire and influence contemporary creative works.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ে অতিসামান্য জ্ঞানার্জন করলেও সেখানে মহাকবি কালিদাসের *অভিজ্ঞানশাকুন্তল*-এর বিষয়গত সারসংক্ষেপ অজ্ঞাত থেকেছে এমন দৃশ্য বিরল। বাল্মীকীয় রামায়ণ এবং বৈয়াসিক মহাভারতের পরেই জনপ্রিয়তার দিক থেকে সংস্কৃতে যে সৃজনশীল সন্দর্ভ সর্বাধিক সুবিখ্যাত, তা *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* যা সাধারণ লোকসমাজে 'শকুন্তলা' ব'লেই বিদিত। মূল সংস্কৃত গ্রন্থটি একটি নাটক। সাতটি অঙ্ক সেখানে বর্তমান। তবে নাটকটি ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় যেমন অনূদিত হয়েছে, তেমনই তার স্বরূপেরও বদল ঘটেছে। অর্থাৎ নাটকটি যে সর্বদাই অভিনয়োপযোগী নাটকেই রূপায়িত হয়েছে এমন নয়; বরং তার বহুবিধ রূপান্তরণও ঘটেছে। এই প্রবন্ধের শিরোনামেই ব্যবহৃত হয়েছে 'শকুন্তলা-ছায়াপট' শব্দবন্ধ। সুতরাং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শকুন্তলার অনুবাদ ও পুনর্নির্মাণ এখানে বক্তব্য বিষয় নয়। সেই নাটকাশ্রিত নব সাহিত্যনির্মিতির রূপরেখাঙ্কনই এখানে উপজীব্য। যেহেতু কালিদাসের *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকটিও বৈয়াসিক মহাভারতোক্ত একটি ঘটনার আলেখ্য রচনা, তাই প্রথমেই দেখা নেওয়া যাক কোনও রচনাশ্রয়ী সাহিত্যের পদ্ধতি কীরূপ হওয়া উচিত।

মহাভারতের আদিপর্বের ৮১তম অধ্যায় থেকেই শুরু হয়েছে পূরুবংশানুক্রমিক বিবরণ। ৮২তম অধ্যায় থেকে শুরু ক'রে ৮৮তম অধ্যায় জুড়ে হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্মন্ত ও পত্নী শকুন্তলার আখ্যান পাওয়া যায়। তবে ৮২তম অধ্যায়টির গ্রন্থনা যে উদ্দেশ্যে সাধিত হয়েছে, তার প্রয়োজন কালিদাসের নাটকে অপ্রয়োজনীয়। সেখানে রাজা দুষ্মন্তের বাহুবল, শৌর্য-বীর্য-ঔদার্যের মহত্তর চিত্র উল্লিখিত হয়েছে -

> "স্বধর্ম্মে রেমিরে বর্ণা দৈবে কর্ম্মণি নিঃস্পৃহাঃ।
> তমাশ্রিত্য মহীপালমাসংশ্চৈবাকুতোভযাঃ।।
> কালবর্ষী চ পর্জ্জন্যঃ শস্যানি রসবন্তি চ।
> সর্ব্বরত্নসমৃদ্ধা চ মহী পশুমতী তথা।
> স্বকর্ম্মনিরতা বিপ্রা নানৃতং তেষু বিদ্যতে।।"[১] (১/৮২/৮-৯)

রাজা দুষ্যন্তের সময়ে সকল বর্ণের প্রজারা স্বধর্মপালনকরতঃ নিরাপদে বসবাস করত, রাজাকে পেয়ে তারা অত্যন্ত অকুতোভয়ে দিনাতিপাত করতে পারত, মেঘ যথাসময়ে বর্ষ করত, রাজ্যে কৃষিসম্পদের প্রাচুর্য ছিল, নানা রত্নভাণ্ডার সমৃদ্ধ ছিল, গবাদি পশু ছিল হৃষ্টপুষ্ট এবং ব্রাহ্মণেরা নিজ কর্ম পালন করতে পারত। এর ব্যত্যয় ঘটত না। কুরুকুলনৃপতি দুষ্যন্তের সমসাময়িক রাজতন্ত্র এবং শাসনপ্রণিধির সুব্যবস্থার দিকটির প্রতি কালিদাসের একপ্রকার ঔদাসীন্য ছিল বলা চলে। তার কারণ মহাভারতের মধ্যে দুষ্যন্তের কাহিনির প্রয়োজনীয়তা রাজবংশের গৌরবগাথার প্রচার কিন্তু কালিদাসের নাটকটিতে বর্ণিত বিষয় মোহ থেকে প্রেমের পথের জয়স্তুতি। তাই দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমোপাখ্যানে যতটুকু দুষ্যন্তের রাজকার্য ব্যবস্থার অবকাশ থেকেছে, ততটুকুই নাট্য পরিসরে ব্যক্ত হয়েছে। একই ভাবে শকুন্তলার প্রিয়সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদাসহ একাধিক চরিত্র কালিদাসের কল্পনা। তাই মহাভারতের একটি ক্ষুদ্রাংশ তাঁর লেখনীতে হয়েছে বৃহত্তর। ঋষি দুর্বাসা অভিশাপবৃত্তান্ত থেকে শুরু ক'রে শাপমোচন এবং শেষে স্ত্রী ও পুত্র সর্বদমনের সঙ্গে দুষ্যন্তের মিলনের সুদীর্ঘ ঘটনা নবতর সাহিত্যগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে স্বয়ং কালিদাস মহাভারতাশ্রয়ী কাহিনির ভাষান্তর ব্যতিরেকে সেই যুগেরই অনুক্ত ভাষ্যের প্রস্ফুটন ঘটিয়েছেন। স্থান-কাল-পাত্র একই বৃত্তে পুনরাবর্তিত হয়েও একটি জীবন দর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকে। তাই এই নাটকের ছায়াপটে যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যনিদর্শনগুলি বর্তমান, সেগুলির মধ্যেও দ্রষ্টব্য যে নবীন-প্রবীণের সেতুবন্ধন কীভাবে ঘটেছে এবং পৌরাণিক যুগের আধুনিকায়ন সেখানে ক'তখানি কাঙ্ক্ষিত থেকেছে অথবা আধুনিক সময়ে পৌরাণিকতার পরিমার্জনা কীরূপে ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যে *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের প্রথম অনুবাদ করেন রামতারক ভট্টাচার্য। সেই নাটকের নাম *অভিজ্ঞানশকুন্তলা* (১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ)। এরপরেই আসেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি গদ্যে অনুবাদ ক'রে কালিদাসের দেওয়া নামটি পরিবর্তন করে রাখেন *শকুন্তলা* (১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ)। এখানে ঘটনাক্রমের সংযোজন-বিয়োজন না ঘটলেও দৃশ্যকাব্যের গণ্ডি অতিক্রান্ত হয়ে সুখপাঠ্য এক কথাসাহিত্যের জন্ম হয়েছে। হরলাল রায়ের *অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকং* (১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ)-এ মূল সংস্কৃত নাটকটির অবয়ব অবিকল থেকেছে। সেখানে শুধুমাত্র সংস্কৃত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষার ব্যবহার ঘটেছে। এরপরে এই নাট্যানুবাদে এগিয়ে আসেন হরলাল রায়। তিনি কালিদাসের অনুসরণে রচনা করলেন *কনকপদ্ম* নাটক (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর সময়ের পূর্বেকার নাট্যগ্রন্থগুলি 'শকুন্তলা' নামটি পরিহার করার দুর্জয় সাহসিকতার পরিচয় দেননি। তিনিই প্রথম বাঙালি নাট্যকার যিনি ওই নামটির পরিবর্তে এক ব্যঞ্জনাধর্মী নতুন নামকরণ করেন। সপ্তাঙ্কপদ্ধতির কলেবর হ্রাস এবং নতুন চরিত্রের চিত্রায়ন দ্বারা একাধিক গর্ভাঙ্কসজ্জিত মোট ছয়টি অঙ্কে তিনি *অভিজ্ঞানশাকুন্তল*-এর সারবস্তুর উপস্থাপন করেছেন। মারীচ, সানুমতী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলিকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। বরং প্রথমাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে তিনি মিশ্রকে ও বনদেবীর বাক্যালাপের অংশ সংযোজন করেছেন যাকে মূল নাট্যবস্তুর প্রস্তুতিপর্ব বলা যায়। তাই সেই সময়ের সাপেক্ষে এই কনকপদ্ম নাটক অনুবাদমূলক বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিবৃত্তে এক উল্লেখ্য পদক্ষেপ। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের সাহিত্যসম্ভারেও এই নাটকের অনুবাদ দেখা যায়। তার নাম *অভিজ্ঞানশকুন্তলা* নাটক (১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই নাটকাশ্রিত *শকুন্তলা* (১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ) নামক একখানি গদ্যরচনা করেন গ্রামবাংলার প্রকৃতির সান্নিধ্য বজায় রেখে এবং রূপকথার মোড়কে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর *অভিজ্ঞান-শকুন্তলা* নামেও পুরাতন সংস্কৃত নাটকটির অনুবাদ করেন এবং এখানে ভাষাগত পরিবর্তন ব্যতীত অপর কোনও সংস্কার দৃষ্টিগোচর হয় না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-ও *শকুন্তলা* অভিধায় একখানি উপন্যাস রচনা করেন এবং এখানেও তিনি কালিদাসের অনুগমন করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে 'অভিজ্ঞানশাকুন্তল' এই নামটির ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে গদ্যানুবাদের ক্ষেত্রে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যাহ্নে এই কালজয়ী নাটকটির অনুবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মঞ্চাভিনয়। যেহেতু সংস্কৃত ভাষা সকলের বোধগম্য ছিলনা, তাই বাংলা ভাষায় সেই বিষয়বস্তুকে সহৃদয় দর্শকদের সম্মুখে নান্দনিক কৌশলে পরিবেশনা করার বাসনা থেকেই বারংবার একাধিক নাট্যকার এই নাটককে বাংলা ভাষার ছন্দে ললিত লাবণ্যময় ক'রে তুলেছেন।

আদর্শ ও আশ্রয় : বাংলা সাহিত্যে *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের আশ্রয়ে যদি কোনও সাহিত্যকর্ম হয়, তবে তার আদর্শ কী হবে? এর উত্তরে বলতে হয় M. Winternitz এর *History of Sanskrit Literature : Vol III* তে Goethe-র এই নাটক সম্পর্কে উক্তিটি একবার স্মরণ করে নিতে হয়। তিনি বলেছিলেন –

> "In case you desire to rejoice in the blossoms of early years, the fruits of the age advanced, In case you want to have something that charms, something that is enchanting. In case you want to call both the heaven and hearth by a common name, I refer you to Śakuntalā. And thus I describe these all."[২]

বাংলায় অর্থ হয় যে কবি কোকিল কালিদাসের এই রচনাটি এমনই অনন্য সুন্দর যে এখানে ফুল-ফল, শরৎ-বসন্ত এবং স্বর্গ-মর্ত্যকে একই সঙ্গে অনুভব করা যায়। এখানের মধ্যে প্রথম এবং তৃতীয় উপমার মধ্যেই যথার্থরূপে *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটকের অনূদিত হওয়ার মূলসূত্র অন্তর্নিহিত হয়ে রয়েছে। 'ফুল'-এর যেমন সহজাত সৌন্দর্য রয়েছে, তেমনই ফলের ভোগ্যতা রয়েছে। তাই ফুল 'উপভোগ্য' কিন্তু ফল 'ভোগ্য'। সুতরাং অভিজ্ঞানশাকুন্তল নাটকের আশ্রয়ে কোনও নতুন আলেখ্যের জন্ম হলে তার মধ্যেও সেই ফুল ও ফলের নিসর্গ সৌন্দর্যের অনাঘ্রাত রসাস্বাদ যেন পাঠক পেয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *প্রাচীন সাহিত্য*-এর প্রবন্ধমালার মধ্যে 'শকুন্তলা' নামের একটি প্রবন্ধ করেছিলেন। সেখানে তিনি কালিদাসীয় কাব্যটির অন্তঃস্থ নির্যাসের কথা বলেছেন যেটি একই সঙ্গে ফুল ও ফলের নিবেদনকে হৃদয়গ্রাহী ক'রে তুলতে পারে। তিনি বলেছেন –

> "স্বর্গ ও মর্তের এই যে মিলন, কালিদাস ইহা অত্যন্ত সহজেই করিয়াছেন। ফুলকে তিনি এমনি স্বভাবত ফলে ফলাইয়াছেন, মর্তের সীমাকে তিনি এমনি করিয়া স্বর্গের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন যে, মাঝে কোনো ব্যবধান কাহারো চোখে পড়ে না।"[৩]

বা অন্যত্র তিনি এও বলেছেন যে –

> "তপোবন স্থানটি এমন যেখানে স্বভাব এবং তপস্যা, সৌন্দর্য ও সংযম একত্র মিলিত হইয়াছে।"[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ বিশেষ থেকে সাধারণীকরণের দিকে গেলে বোঝা যায় যে 'সৌন্দর্য' উপভোগ তখনই সম্ভব যখন ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাম্য বিরাজ করবে। স্থিতধী মন-ই পারে বাহ্য আড়ম্বর থেকে শান্তসুন্দরের সংযত সৌন্দর্যকে অনুধাবন করতে। অর্থাৎ শকুন্তলাকেন্দ্রিক যে সাহিত্য রচনা-ই হয়ে থাকুক না কেন; সেখানে যেন প্রস্তুতি থেকে প্রগতির দিকে অনায়াস যাত্রার মঙ্গলধ্বনি শ্রুত হয়।

শকুন্তলা-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্য : অনুবাদ ব্যতীত বাংলা সাহিত্যে শকুন্তলা বিষয়ে দ্বিতীয় ধারাটি হল এমন এক সাহিত্যচিন্তন যা কালিদাসের রচনার অংশবিশেষের দ্বারা প্রভাবিত বা কোনও অনুষঙ্গের আপেক্ষিক অনুপাতে গড়া এক বাঙ্ময়। এর মধ্যে আসেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু এবং সেলিম-আল-দীন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে কবি মধুসূদনের *বীরাঙ্গনা* কাব্য প্রকাশিত হয়। এটি পত্রসাহিত্যবিশেষ। এখানে একাধিক পত্রাবলির মধ্যে প্রথম সর্গটি দুষ্যন্ত-শকুন্তলা-কেন্দ্রিক ('শকুন্তলা পত্রিকা')। সেই কাব্যাংশটির নাম 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা'। এখানে শকুন্তলার মননে দুষ্যন্তের প্রতি বিরহতাড়িত প্রেম অভিব্যক্ত হয়েছে। এরপর আসে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তাঁর গোয়েন্দা চরিত্র ব্যোমকেশের গল্পসংগ্রহে 'বহ্নি-পতঙ্গ' নামে একটি গল্প রয়েছে (১৩৩২ বঙ্গাব্দ)। সেই গল্পের নায়িকা শকুন্তলা নামের এক নারী। রাজশেখর বসু-র ছোটগল্পের সংকলন *ধুস্তরী মায়া ইত্যাদি গল্প*-এর একটি গল্প 'ভরতের ঝুমঝুমি'। এই গল্পের প্রেক্ষাপট স্বাধীনতা পরবর্তী খণ্ডিত ভারতের রাজনৈতিক পটভূমি। শুধুমাত্র দুর্বাসা ঋষি ও শকুন্তলার পুত্র ভরতের প্রসঙ্গের ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকেই এই গল্পের বিন্যাস। এছাড়া সবশেষে বলতে হয় বাংলাদেশের নাট্যকার সেলিম-আল-দীনের কথা। তাঁর শকুন্তলা দৃশ্যকাব্য (নাট্য) শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্তের বিড়ম্বনাধর্মী। বাংলাদেশের জনপ্রিয় বাঙালি নাট্যকারদের মধ্যে সেলিম-আল-দীন (১৯৪৯-২০০৮) যশস্বী নাট্যব্যক্তিত্ব। *শকুন্তলা* ১৯৭৮ সালের (খ্রিস্টাব্দ) রচনা। বর্তমানে সেলিম-আল-দীনের নাটক সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে এই নাট্যরচনাটি মুদ্রিত হয়েছে। বাংলাদেশের নাট্যকার সেলিম-আল-দীনের শকুন্তলা একটি 'দৃশ্যকাব্য'। অর্থাৎ কালিদাস তাঁর নাট্যকৃতিটিকে 'নাটক' জাতীয় রূপকবিশেষ ব'লে আখ্যায়িত করলেও সেলিম-আল-দীন তাঁর এই রচনাটিকে 'নাটক' বলেননি। শকুন্তলা দৃশ্যকাব্যটি দুটি ভাগে বিভক্ত - 'স্বর্গীয় ষড়যন্ত্র খণ্ড' এবং 'শকুন্তলা খণ্ড'। প্রথম খণ্ডভাগে রয়েছে শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডভাগে রয়েছে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্তের প্রকাশ। প্রথম খণ্ডে পাওয়া যায় বিশ্বামিত্র, মেনকা, অর্করূপী নারদ, দেবরাজ ইন্দ্র, মহাভিষ, উতঙ্ক, লৌহিত্য, পত্রলেখা এবং ইন্দ্রলেখার চরিত্র। দ্বিতীয় তথা 'শকুন্তলা খণ্ড'-এ রয়েছে শকুন্তলা, মহর্ষি কণ্ব, গৌতমী, শারঙ্গ, শারদ্বত, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, চণ্ডালগণ এবং ভিষক। তাহলে দেখা যাচ্ছে যদি একমাত্র দ্বিতীয় খণ্ডটির মধ্যে চণ্ডাল এবং ভিষক ব্যতীত প্রতিটি চরিত্রই কালিদাসাশ্রিত। তবে প্রথম খণ্ডের মধ্যে বিশ্বামিত্র এবং মেনকা এই চরিত্রদুটি শকুন্তলার মাতাপিতা। কালিদাসের নাটকে এদের নাট্যবৃত্তে অবস্থান না থাকলেও প্রথম অঙ্কেই উক্তিতে বিশ্বামিত্র ও মেনকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি পঞ্চম অঙ্কেও মেনকার উল্লেখ রয়েছে। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে তার উপস্থিতি যে তার ব্যক্তিজীবনকে ক'তখানি দুর্বিষহ ক'রে তুলেছিল, তারই বিবৃতি দেয় এই দৃশ্যকাব্য। সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে এ কাহিনির সবিশেষ যোগসূত্র না থাকার দরুণ এটিকেও দ্বিতীয় ধারাতেই নির্বিবাদে অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

এই দুটি বহমান ধারার মধ্যে এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় দ্বিতীয় প্রকার ধারাটিই; কারণ এখানে *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের অনুবাদে একাধিক নাট্যকার এবং গদ্যকারের শব্দচয়ন বিষয়ক তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। নাটকাশ্রয়ী কোনও ঘটনা বা ঘটনাংশের আধুনিকায়ন, বাস্তব প্রেক্ষিত এবং কবিমননের তারতম্যই উজ্জ্বল হয়ে ওঠার কথা বলে। তাই এক্ষেত্রে সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং রাষ্ট্রনৈতিক উত্থান-পতনের কারণে মূল বিষয়টি যদি কোথাও নিষ্প্রভ হয়ে অন্য আরেকটি দ্বার উন্মোচিত করে, তবে তাই তুলে ধরা হোক।

দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা : কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই কাব্যে যে ভঙ্গিমায় শকুন্তলার পত্রলিখনের কথা তুলে ধরেছেন, তার প্রাথমিক পরিচয় তা অমিত্রাক্ষর ছন্দনৈপুণ্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি। *অভিজ্ঞানশাকুন্তল*-এর চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে বিষ্কম্ভক অংশে যেখানে অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কথোপকথনে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার গান্ধর্ব বিবাহ এবং দুষ্যন্তের পুনরায় রাজধানীগমনের তথ্য পাওয়া যায়, সেখানে শকুন্তলার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি কালিদাস দেখাননি। দুর্বাসার কঠোর অভিশাপবাণী থেকে জানা যায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সেই সময় শকুন্তলা ছিল 'অনন্য মানসা'। দয়িতের বিরহে সে যেন উৎকণ্ঠিতা নায়িকা। মধুকবি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন তাঁর কাব্যে। সংস্কৃত নাটকটির প্রথমাঙ্কে শকুন্তলার কাছে ভ্রমরের আগমন ও দংশনেচ্ছার রূপকটিকে কবি এখানে যথা সুন্দর প্রয়োগ করেছেন –

"ডাকি উচ্চে অলিরাজে; কহি, 'ফুলসখে
শিলীমুখ, আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরি
এ পোড়া অধর পুনঃ! রক্ষিতে দাসীরে
সহসা দিবেন দেখা 'পুরু-কুল-নিধি!"[৫]

এখানে সমাজতত্ত্বের দিকটি লক্ষণীয়। উক্ত পঙক্তিসহ কাব্যের শুরুতেই শকুন্তলা নিজেকে পরিচয় দিয়েছে 'বননিবাসিনী দাসী' ব'লে। এটি তৎকালীন বঙ্গসমাজের অসূর্যম্পশ্যা কুলবধূদের আকুতি। স্বামীর সেবাই স্ত্রীর ধর্ম এই আদর্শবাদিতা থেকেও কবি যেন মুক্ত হতে পারেননি। তাই কালিদাসের কবিত্বে এরূপ বিশেষণ না থাকলেও মধুসূদন দত্ত এখানে বাঙালি সংস্কৃতির ছাপ রেখেছেন। তাই শকুন্তলা এখানে অবিরত বিরহযাপিতা একাকিনী এক কুলবধূর প্রতীকী ব্যঞ্জনা। এখানেই যুগসন্ধির অন্তরঙ্গতা। পৌরাণিক কালের ক্ষণিক নির্যাসে সমকালের রূপ তুলে ধরাই কবিধর্ম। আবার কবির উৎপ্রেক্ষা এমনই যে শকুন্তলা যেন ভুর্জপত্রে দুষ্যন্তের জন্ পত্ররচনা করছে। তাই তিনি বলেছেন –

"কহি পিকে, - 'কেন তুমি পিককুল-পতি,
এ স্বরলহরী আজি বরিষ এ বনে?
কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দ কালে?
মদনের দাস মধু; মধুর অধীনে
তুমি ; সে মদন মোহে যাঁর রূপ গুণে,
কি সুখে গাও হে তুমি তাঁহার বিরহে?'
অলির গুঞ্জন শুনি ভাবি – মৃদু স্বরে
কাঁদিছেন বনদেবী দুঃখিনীর দুঃখে!"[৬]

সুতরাং, শকুন্তলার উতলা মনের সামান্য ইঙ্গিত থেকেই যে নতুন অলংকৃত কাব্যসৌন্দর্যরস পাঠকের কাছে উপহাররূপে এসেছে, তার জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকতেই হয় কবির কাছে। তাই অনুক্ত বিষয়ের অনুমান এবং অশ্রাব্য বাণীর প্রকাশ এই দুদিক থেকেই কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত উত্তীর্ণ। তাঁর পারঙ্গমতা শুধু ব্যবহারিক দিক থেকেই নয়; কবিকল্পনার অবকাশ যাপনেরও।

শকুন্তলা ও শকুন্তলা : এই পর্বে দেখা যাক কালিদাসের শকুন্তলার সঙ্গে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শকুন্তলার মৈত্রী সম্বন্ধ ক'তখানি রয়েছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালি সাহিত্যিক। তাঁর ব্যোমকেশ সমগ্র এবং অন্যান্য রচনায় কালিদাসের প্রসঙ্গ এসেছে। কুমারসম্ভবের কবি যেমন কালিদাসের জীবনসত্যের উপলব্ধি, তেমনই ব্যোমকেশের 'অমৃতের মৃত্যু' গল্পে তিনি "আকার-সদৃশী প্রজ্ঞা"[৭] শব্দবন্ধের উপমা দিয়েছেন যা *রঘুবংশ* মহাকাব্যের প্রথম সর্গের রাজা দিলীপের বর্ণনা। সুতরাং এ থেকেই পরোক্ষ প্রমাণ মেলে যে 'বহ্নি-পতঙ্গ' গল্পটিও তাঁর এক গভীর সমীক্ষা। পাটনা নিবাসী বিহারের জমিদার সন্তান দীপনারায়ণ সিংয়ের স্ত্রী শকুন্তলা। গল্পের বর্ণনায়–

> "সুন্দরী এবং বিদুষী। কলানিপুণা, নাচতে গাইতে জানেন, ছবি আঁকতে জানেন, তার ওপর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তেজস্বিনী ছাত্রী, বি. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।"[৮]

স্বামীর সঙ্গে ছিল তার বয়সের ব্যবধান অধিক। তাই তার দেহজ বাসনার তীর এসে বিদ্ধ করে ইন্সপেক্টর রতিকান্ত চৌধুরীকে। সহজেই চরিতার্থ হয় তাদের নিষিদ্ধ পরকীয় কামনা। কিন্তু রতিসুখ তাদের চিরস্থায়ী হয়না। দীপনারায়ণ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সিংহয়ের হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত হওয়ার ভরে তারা উভয়েই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। ইতিবৃত্তটির কাঠামো এরূপ হলেও তাদের সম্পর্কের সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞান ধরা পড়ে বুননের চাতুর্যে যা কালিদাসের অভিজ্ঞানশাকুন্তল নাটকের মূলীভূত শাশ্বত সত্যচেতনা। প্রথম রিপু কামের বশবর্তী নায়ক-নায়িকার গান্ধর্ব বিবাহ হলেও সম্পর্ক পরিণতি পায়নি। তার জন্যই কর্মফলজন্য অভিশাপ নেমে আসে শকুন্তলার জীবনে। যখন সেই নিরন্তর বিরহ এবং আত্মোপলব্ধির বোধোদয় হয়, তখন সেই মোহবেশী কামের কলি পরিণতি পায় প্রেমের পুষ্পল শোভা। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ পঞ্চ তন্মাত্রের জাগতিক সুখভোগের ঐকান্তিকতা একইভাবে সীমায়িত করে রেখেছিল 'বহ্নি-পতঙ্গ' গল্পের রতিকান্ত-শকুন্তলাকে। রতিকান্তের পরিচয় –

> "ওর পূর্বপুরুষেরা প্রতাপগড়ের মস্ত তালুকদার ছিল। প্রায় রাজরাজড়ার সামিল। এখন অবস্থা একেবারে পড়ে গেছে, তাই রতিকান্তকে চাকরি নিতে হয়েছে। ...খাসা চেহারা ছোকরার! যেন রাজপুত্তুর!"[৯]

ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত পরিবারের যুবক সুপুরুষ রতিকান্তের মধ্যেও সেই ক্ষত্রিয়ত্বের ছায়া রয়েছে যা দুষ্যন্তের সঙ্গে কোথাও যেন একীকৃত হয়ে যায়। *অভিজ্ঞানশাকুন্তল*-এর প্রথমাঙ্কে দুষ্যন্তের কথায় উঠে আসে –

> "ভবতি, যঃ পৌরবেণ রাজ্ঞা ধর্মাধিকারে নিযুক্তঃ সো'হমবিঘ্নক্রিযোপলম্ভায ধর্মারণ্যমিদমাযাতঃ।"[১০]

পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত রাজা হওয়ায় সে বনে যজ্ঞাদিক্রিয়া ধর্মপথে সুষ্ঠুভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শনের জন্য বেরিয়েছে। এই বাক্যটি দুষ্যন্তের বংশমর্যাদা এবং তার রাজোচিত গুণের সমাদর জানায়। আবার ষষ্ঠ অঙ্কে সে শোকতাপকে অনুগত ক'রেই দেবাসুরের যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে। তাই ক্ষত্রিয় পুরুষরূপে দুষ্যন্তের চরিত্রচিত্রণ হয়েছে বহুমুখী। এদিকে রতিকান্তের পেশা নগর ও নাগরিকদের সুরক্ষাপ্রদান। তাই ক্ষত্রিয় বংশজ রাজোচিত পরিচয়ের সঙ্গে কুরুকুলনরেশ দুষ্যন্তের মিল লক্ষ্য করা যায়। আবার তার নামের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আদি রস শৃঙ্গারের স্থায়িভাব 'রতি'-র দীপ্ততা। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তদনুযায়ী নামকরণ সাহিত্যের এক কর্তব্য। তাই শকুন্তলার প্রতি তার অভিসন্ধি যে স্বতঃপ্রবৃত্ত, তা পাঠকের অজানা থাকেনা। কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গে দেখিয়েছিলেন শিবের নেত্রাগ্নিতে কামের দহন তথা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সেই কামের উত্তরণ ঘটে বিশুদ্ধ নির্মল প্রেমে যা নিরাকার এবং অনন্ত। তাই শকুন্তলাসহ রতিকান্তের মৃত্যু এক আলংকারিক ব্যঞ্জনা। রতিসর্বস্ব আত্মসুখ নিজ কামাগ্নিতেই দগ্ধ হয়ে গেছে। এখানেই দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলনের প্রতিলিপি অনুভব করা যায়।

শকুন্তলা ও মহামুনি দুর্বাসা : তৃতীয় যে সাহিত্যরচনাটির নামোল্লেখ করণীয়, তা রাজশেখর বসু তথা পরশুরামের ছোটগল্প 'ভরতের ঝুমঝুমি'। এই গল্পে যা প্রত্যক্ষ উপস্থিতি রয়েছে, তিনি মহামুনি দুর্বাসা। হরিদ্বারে দেখা লেখকের উক্তিতে তিনি–

> "একজন বৃদ্ধ সাধুবাবা। রংটা বোধহয় এককালে ফরসা ছিল, এখন তামাটে হয়ে গেছে। লম্বা, রোগা, মাথার জটাটি ছোট কিন্তু অকৃত্রিম, গোঁফ আর গালের ওপর দিকের দাড়ি ছেঁড়া ছেঁড়া, যেন ছাগলে খেয়েছে। কিন্তু থুতনির দাড়ি বেশ ঘন আর লম্বা, নিচের দিকে ঝুঁটির মতন একটি বড় গেরো বাঁধা। দেখলে মনে হয় গেরোটি কোনও কালে খোলা হয় না। পরনের গেরুয়া কাপড় আর কাঁধের কম্বল অত্যন্ত ময়লা। সর্বাঙ্গে ধুলো, গলায় তেলচিটে পইতে, হাতে একটা ঝুলি আর তোবড়া ঘটি। রুদ্রাক্ষের মালা, ভস্মের প্রলেপ, গাঁজার কলকে, চিমটে, কমণ্ডলু প্রভৃতি মামুলী সাধুসজ্জা কিছুই নেই।"[১১]

কালিদাস প্রাচীন নাট্যতত্ত্ববিধি মেনেই দুর্বাসাকে মঞ্চের নেপথ্যেই রেখেছিলেন। শুধু শোনা যায় শকুন্তলার প্রতি তার ঘোর অভিসম্পাত। অথচ এই গল্পে তিনি সশরীরে উপস্থিত। লেখক ও তার দোসরদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথোপকথনের পরে জানা যায় তিনিই সে পুরাপ্রসিদ্ধ স্বভাবকোপন মহামুনি দুর্বাসা। শকুন্তলাকে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা ক'রে একদা তিনি যখন গঙ্গোত্রী তীর্থে পুণ্যব্রত হয়েছেন, তখনই একদিন শকুন্তলা জননী অপ্সরা মেনকার আগমন ঘটে এবং পরুষ বাক্যে জানায় যে শকুন্তলা বিনা দোষে দুরূহ শাস্তিভোগ ক'রে চলেছে। তাই মহাদেবের ক্রোধবর্ষণ হতে পারে দুর্বাসার প্রতি। তাই দুর্বাসা যদি শকুন্তলার পুত্র ভরতকে গিয়ে মেনকার উপহার ঝুমঝুমি দিয়ে আসে, তবে তিনি দেবাদিদেবের কৃপাধন্য হতে পারেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাই বিনা বাক্যব্যয়ে দুর্বাসা চলে যায় শকুন্তলার কাছে কিন্তু ভাগ্যদোষে সেই ঝুমঝুমি খুঁজে পাননা। সেই থেকেই দুর্বাসার মন অশান্ত হয়ে রয়েছে। এমনই সময় দুর্বাসার সঙ্গে লেখক ও তাঁর সহযাত্রীদের ধ্বস্তাধ্বস্তিতেই তার অপরিচ্ছন্ন শৃঙ্খলের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসে সেই ঝুমঝুমি কিন্তু তার শেষ রক্ষা হয় না। দীর্ঘদিন ধরে থাকা ঝুমঝুমি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এই গল্প তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমির অনুপাতে ছিল এক জীবন্ত দলিল। শকুন্তলার রাজচক্রবর্তীলক্ষণযুক্ত পুত্র ভরত এবং তৎপরবর্তী যুধিষ্ঠির থেকে শুরু ক'রে পরীক্ষিত রাজার যুগ কালের গতিতে নিঃশেষিত হয়েছে এবং অন্ধ্র, মুঘল শাসনের পরেও অক্ষত থাকা ভারতবর্ষ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি দেশের জন্ম হয় – ভারত এবং পাকিস্তান (পূর্ব-পশ্চিম)। গল্পকার পরশুরামের সাহিত্য প্রতিভার বলিষ্ঠতা এতই প্রখর যে তিনি এখানে পূর্ণাঙ্গ রূপকের উপমায় দেশভাগের চিত্রকল্পকে তুলে ধরেছেন। ভরত বংশ থেকেই 'ভারত' দেশের নামকরণ এই ঐতিহাসিক তথ্যকে স্মরণে রেখে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে শকুন্তলার পুত্র ভরতের স্নেহসম্পদ ভারত দেশ নানা ঘাত-প্রতিঘাত উপেক্ষা ক'রেও অবিভক্ত ছিল কিন্তু সেই ঝুমঝুমি ম'তই ভারতভূমিও দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। দেশভাগের যন্ত্রণা এবং খেদ-ই এই গল্পের প্রণোদনা। তাই একটি রাষ্ট্রনৈতিক অস্থিরতা এবং ভারতবাসীর হাহাকারের করুণ রস এই গল্পে ধ্বনিত হয়েছে। তাই দুর্বাসা এখানে ভারতবাসীর সম্প্রীতি ও সংস্কৃতির প্রতীক এবং ভরতের ঝুমঝুমি হ'ল উত্তরে হিমাদ্রি থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতবর্ষ। সুতরাং একটি অপ্রত্যক্ষ চরিত্রকে লক্ষ্য ক'রে এবং প্রতীকী সাহিত্যগুণে এই আধুনিক বাংলা ছোটগল্পটি *অভিজ্ঞানশাকুন্তল*-এর যেন উত্তর প্রজন্ম হয়ে উঠেছে। মায়ের গর্ভ থেকেই যেমন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তেমনই কালিদাসের নাটকটি থেকে প্রসূত হয়ে স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠেছে এই গল্প।

স্বর্গ ও শকুন্তলা : সেলিম-আল-দীনের এই *শকুন্তলা* দৃশ্যকাব্য কতখানি মহাকবি কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটককে অনুসরণ করেছে এবং কতখানি স্বাধীন থেকেছেন, তার জন্যই এই আলোচনা। আধুনিক যুগে শকুন্তলাশ্রিত রচনাবলির মধ্যে এটিই সর্বাপেক্ষা স্বাধীন ও সচেতন। শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্তকে অনুসরণ করেই নাট্যকারের মনে যে প্রশ্নগুলি তৈরি হয়েছে, তা-ই দর্শক বা পাঠকের কাছে জিজ্ঞাসা হয়ে উঠে এসেছে। মেনকা একজন সুরাঙ্গনা। রমণীয় ছলাকৌশল তার প্রাণ। তাই মেনকার কন্যা হওয়ার গোপন তথ্যপ্রকাশ যদি কখনও তপোবনের আশ্রমে প্রকাশ পায়, তবে তাকে কী ধরণের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হত, তারই আভাস এ দৃশ্যকাব্যে ভাস্বর। 'স্বর্গীয় ষড়যন্ত্র' অংশে দেখা যায় যে বিশ্বামিত্র এবং ইন্দ্রের যুদ্ধ আসন্ন। তাই স্বর্গ-মর্ত্যের এই যুদ্ধকে প্রতিহত করার জন্যই ইন্দ্রের নির্দেশে অর্কের ছদ্মবেশে নারদ মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়। বিশ্বামিত্রের জন্য সে সন্ধান করে 'কামবৃক্ষের রস' যা সেবনে বিশ্বামিত্রের রতি জাগ্রত হবে। ইন্দ্রের রাজনৈতিক কূটনীতি জয়লাভ করে। বিশ্বামিত্র সেই রস সেবন করে এবং অপ্সরা মেনকার সঙ্গে রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। ফলতঃ মেনকা এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। 'শকুন্তলা' অংশটির নাট্যক্রিয়ার আধার মহর্ষি কণ্বের তপোবন। সেখানে বয়সের ঔচিত্যানুযায়ী শকুন্তলা ঋতুমতী হয়। এমনকি রক্তক্ষরণের ম'ত উপসর্গ দেখা দিলে ভিষক এসে উপস্থিত হয়। অন্যদিকে কণ্ব এবং গৌতমী চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। ভিষক আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতে শকুন্তলার রোগনির্ণয়েই সন্দেহপ্রকাশ করে যে শকুন্তলা কোনো মর্ত্যবাসী মানবীর সন্তান হতে পারেনা। আশ্রমের আবহাওয়া ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা তাদের প্রিয়সখী শকুন্তলার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। এমনই সময়ে দুঃসংবাদ এসে পৌঁছায় যে চণ্ডাল কর্তৃক আশ্রমমৃগ নিহত হয়েছে। শোকে জর্জরিত শকুন্তলা তখনই জানতে পারে যে মহর্ষি কণ্ব তার জন্মদাতা নয়। গৌতমী তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেও শকুন্তলা এই সত্যশ্রবণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। বিষণ্ণ শকুন্তলা নিজেকে অশুদ্ধ মনে করে। আত্মগ্লানি ও মানসিক পীড়ায় ধীরে ধীরে সে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

এই দৃশ্যকাব্যটি কতখানি কালিদাসীয় অনুষঙ্গকে আত্মস্থ করেছে তা উল্লেখ্য। কাহিনি অনুসারে বলা যেতে পারে যে নাট্যবস্তুগত সাযুজ্য অপেক্ষা চরিত্রের অবস্থানগত সাযুজ্য লক্ষ্য করা গেছে। তাই এখানে বিচার্য হল কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটকটির প্রভাবে সেলিম-আল-দীনের *শকুন্তলা* নাটকটির প্রতিক্রিয়া কীরূপ হয়েছে। অর্থাৎ দৃশ্যকাব্যটির দ্বিতীয় খণ্ডে শকুন্তলা-কণ্ব-গৌতমী-শারঙ্গ-শারদ্বতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কালিদাসের প্রভাবে মূর্ত হয়েছে। *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটকের চতুর্থ অঙ্কে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলার পরিগৃহীত যাত্রাকালে যেভাবে অপত্যস্নেহে গৌরব ও ভারবত্ব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লাভ করেছে, তার প্রতিলিপি এখানে না থাকলেও উভয়ের সম্পর্কের মনস্তত্ত্ব সমতা রক্ষা করেছে। মূল নাটকে কণ্ব পিতৃস্নেহে শকুন্তলাকে বলেছে –

> "যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদযং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠযা
> কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষঃ চিন্তাজডং দর্শনম্।
> বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমিদং স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
> পীডন্ত্যে গৃহিনং কথং নু তনযাবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ।।"[১২] (৪/৮)

অর্থাৎ মহর্ষি কণ্ব আর্দ্র চিত্তে বলেছে যে একজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও তার বিগলিত অশ্রু বাধা মানেনি। সুতরাং শকুন্তলা পালিতা কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিও পিতা কণ্বের বাৎসল্যের অভিব্যক্তি ঘটেছে। এই দৃশ্য সেলিম-আল-দীনের দৃশ্যকাব্যেও লক্ষণীয়। শকুন্তলার জন্মেতিহাস প্রকাশ পাওয়ার আগেই সে আশঙ্কা করে –

> "তার জন্ম তাকে নিঃসঙ্গ করে দেবে – লোকালয়ে থেকে লোকাতীত ঘৃণা ও ব্যবহার পাবে। -এর চেয়ে মৃত্যুই ভালো।"[১৩]

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কণ্ব-শকুন্তলার সম্পর্কের অঙ্গিরস বিপথে যায়নি। এছাড়াও আশ্রমমৃগের প্রসঙ্গও সেলিম-আল-দীন নাট্যে এনেছেন। এখানে দেখানো হয়েছে চণ্ডালদের দ্বারা তার হনন হয়েছে যা কালিদাসের রচনা থেকে স্বতন্ত্র সংযোজন। মূল সংস্কৃত নাটকটির চতুর্থ অঙ্কে দেখি "উদ্গলিতদর্ভকবলা মৃগাঃ।"[১৪] শকুন্তলা যখন আশ্রম পরিত্যাগ করছে, সেই শোক বহন ক'রে চলেছে আশ্রমের হরিণশাবকরা। তারাও শকুন্তলার সঙ্গে সমব্যথী। এছাড়াও প্রথমাঙ্কে রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়ার্থে হরিণবধোদ্যত হলে বৈখানস বলে ওঠে সেই চিরন্তন শ্লোক –

> "ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যো'যমস্মিন্
> মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।"[১৫] (১/১০)

এখানে হরিণের প্রতি শরনিক্ষেপ না হলেও তার সম্ভাব্য ফল জানিয়েছে বৈখানস। সাহিত্যিক পরিভাষায় ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মে এই মৃগের পেলব শরীর শকুন্তলার হৃদয়ের সুকোমলতা। তাই সেখানে আঘাত হলে তার পরিণাম যে তীব্র বেদনাময় হতে পারে, তার আভাস দিয়েছেন কালিদাস। সেলিম-আল-দীনের *শকুন্তলা*-য় মৃগবধেরই উল্লেখ রয়েছে। সেই প্রসঙ্গেই প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বলেছে – "হায় প্রিয় বোন - মৃতের অভিজ্ঞান নিয়ে বুকের ভিতরে তুমি কেবলই শোকার্ত হবে।" নাট্যকার এখানে 'অভিজ্ঞান' শব্দেরও ব্যবহার দেখিয়েছেন। এখানে 'মৃতের অভিজ্ঞান' হ'ল বিগত স্মৃতিসম্পূট। অতীতের স্মৃতিভার বা স্বর্গীয় চক্রান্তে তার জন্মের কথা যে তাকে আহত করতে পারে, তারই সুস্পষ্ট দ্যোতনা প্রিয়ংবদার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মূল নাটকে 'অভিজ্ঞান' ছিল ক্ষুদ্রার্থে অঙ্গুরীয়ক এবং বৃহদর্থে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুত্র সর্বদমন। তার রেশ এই নাট্যপরিধিতে না আসায় এই স্মারক বা 'অভিজ্ঞান' শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছে তার সঙ্গে ভোগলোলুপতার সম্বন্ধ। অর্থাৎ যেহেতু সে মেনকার সন্তান, তাই তার মধ্যেও যেন সেই লালসার চিহ্ন রয়ে যেতে পারে এমনই নাট্যকারের বক্তব্য। এর কারণ এখানেও এটি রূপকার্থে প্রযোজ্য। তার জন্মের ইতিবৃত্ত শ্রবণে প্রকৃতির সহজন্যা শকুন্তলা যে কতখানি আহত হতে পারে, তারই আভাস। তাই নাট্যকার এখানেও পূর্বজ কালিদাসের কাছে ঋণী। এছাড়াও প্রথম খণ্ডে তিনি 'চীনাংশুক' শব্দের উল্লেখ করেছেন। কৌশিকী নদীর কাব্যিক বর্ণনায় অর্করূপী নারদের কথনে রয়েছে –

> "আজ সে পরেছে ক্রৌঞ্চ মিথুন আঁকা শাড়ি। এত লাজুক এ নারী যে – ওই চীনাংশুক তার কেউ যদি তর্জনীতে তুলে নেয় লজ্জায় কিছু বলবে না।"[১৬]

এই শব্দবন্ধ ব্যবহারে যথার্থ কারণ অনুমান করা যায়না। 'চীনাংশুক' একপ্রকার মসৃণ পট্টবস্ত্র। *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের প্রথমাঙ্কের শেষ শ্লোকে এর উল্লেখ পাওয়া যায় – "চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীযমানস্য"[১৭] (১/৩৬) হিসেবে। রথের শিরোস্থানে উড্ডীয়মান পতাকাটি চীনাংশুক পট্টের। তাই নদীর জলের স্বচ্ছতার দ্যোতকই এই শব্দব্যবহারের হেতু।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাই সেলিম-আল-দীনের এই নাটকের উপজীব্য বিষয় *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাকি স্বয়ং শকুন্তলা; সেটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। ইতিবৃত্তের মধ্যে দুষ্যন্তের চরিত্র অনুপস্থিত। এমনকি দুষ্যন্তের চরিত্রের অনুপ্রবেশের মতো কোনো উপযুক্ত ক্ষেত্রও প্রস্তুত করেননি নাট্যকার। তাই এই দৃশ্যকাব্য মূল *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটকের প্রথমাঙ্কের সূচনারও প্রাককথন বলা যেতে পারে। শকুন্তলা বা একজন কন্যা সন্তান যদি তার পিতামাতার অবৈধ সন্তান হয়, তাহলে সেকথা জানার পরে তার মনোগতি ক্রমঃস্পন্দিত রূপের প্রতিলিপি তৈরিই এই দৃশ্যকাব্যে বিষয়বস্তু। শকুন্তলার মধ্যে যে খেদ সঞ্চারিত হয়েছে, তার কথা কালিদাসের নাটকে দৃশ্য নয়। এমনকি পালিত পিতা কণ্ব এবং মাতাস্বরূপা গৌতম সঙ্গে তার সম্পর্কের গতিবিধিও কালিদাসের কাব্যে অভিধেয় রূপে বাচ্য হয়নি। অর্থাৎ সেলিম-আল-দীনের এই দৃশ্যকাব্যকে কবিকল্পিত বিষয়াশ্রয়ী নাট্যসন্দর্ভই বলা না গেলেও বলা যায় যে এটি নাট্যবিষয়গত নবীন সমীক্ষণ। এখানে নাট্যকাহিনির একাংশের অনুসরণ ঘটেছে।

কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটকের প্রথম অঙ্কের ঘটনাস্থান কণ্বের আশ্রমের তপোবন। সেখানে পুরুবংশীয় রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে দূর থেকে প্রত্যক্ষ করে। তবে তার সঙ্গে বাক্য বিনিময় না ঘটলেও অপর দুই আশ্রমতনয়া অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সঙ্গে রাজার মধুরালাপ চলতে থাকে। সেই সময় শকুন্তলার পিতৃপরিচয় জানতে উদ্গ্রীব দুষ্যন্তকে অনসূয়া বলে –

> "শৃণোতু আর্যঃ। গৌতমীতীরে পুরা কিল তস্য রাজর্ষেরুগ্রে তপসি বর্তমানস্য কিমপি জাতশঙ্কৈঃ দেবৈঃ মেনকা নাম অপ্সরা প্রেরিত নিযমবিঘ্নকারিণী। ...ততঃ বসন্তোদারসময়ে তস্যাঃ উন্মাদযিতৃ রূপং প্রেক্ষ্য।"[১৮]

অতএব পুরাকালে কোনো এক সময়ে রাজর্ষির (বিশ্বামিত্র) ধ্যানভঙ্গহেতু দেবতারা মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে মর্ত্যে প্রেরণ করে। অতঃপর বসন্ত কালোচিত মদনতাপিত হয়ে রাজর্ষি-অপ্সরার কন্যাসন্তান জন্মায়। অনসূয়ার বাক্যশ্রবণেই রাজা বুঝতে পারে তার পরিণামের কথা এবং তার বোধ জন্মায় যে শকুন্তলা সেই বিশ্বামিত্র-মেনকার সন্তান। অনসূয়া এও বলে –

> "উজ্ঝিতাযাঃ শরীরসংবর্ধনাদিভিঃ তাতকাশ্যপঃ অস্যাঃ পিতা।"[১৯]

অর্থাৎ শকুন্তলা পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হলে তখন মহর্ষি কণ্বই তার লালনপালন করেছে। যেহেতু বিশ্বামিত্র-মেনকার আখ্যানভাগটি কালিদাসের নাটকে মঞ্চায়িত হওয়ার সুযোগ নেই, তাই নাট্য কৌশলরীতিতেই কালিদাস এই তথ্যটি পরিবেশন করেছেন এবং সেলিম-আল-দীন এই তথ্যটির ওপর ভিত্তি ক'রেই তাঁর *শকুন্তলা* দৃশ্যকাব্যের আদর্শ চিত্ররূপকল্প নির্মাণ করেছেন। 'শকুন্তলা খণ্ড' অংশে গৌতমী বলে ওঠে –

> "স্বর্গের নীল নটনটী গৌতমীর অভিশাপ নাও। একজন জননী সে মা হতে পারে নি – আর একজন মা – সে শুধু জননী নয় বলে মা হতে পারলো না।... শকুন্তলা বিশ্বমিত্রের তপোভঙ্গের ফল। নটী মেনকার গর্ভজাত সন্তান সে।"[২০]

এরপরই শকুন্তলার বর্তমান জীবন আন্দোলিত হয়। সে বর্তমানকে অতীতের দর্পণে দেখতে চায়। তাই তার আর্তস্বর জানায় –

> "আমি শকুন্তলা নই। এ তোমাদের দেয়া নাম। এ নাম তোমাদের বানানো – আমার, জন্মের মতো বানানো। আমার নাম আসবে ওই নীলাভ্র থেকে – আমার জননীর উদর থেকে – পুষ্পল সুন্দর নাম।... ওই শোনো বনমর্মরে আমার মা বলে – অভ্রের ডানা দেবো তোকে। খাদ্যনালী ছিঁড়ে ফেললেই তুই অমল উজ্জ্বল হবি। - আজ আমি পবিত্র হবো।"[২১]

শকুন্তলার এই স্বগতোক্তি কালিদাসের নাটকে মূর্ত হয়নি। যদিও পঞ্চম অঙ্কে রাজার শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যানের পরে শার্ঙ্গরবের থেকে সরোষভাষণ শ্রুত হয় –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"যদি যথা বদতি ক্ষিতিপস্তথা
ত্বমসি কিং পিতুরুৎকুলযা ত্বযা।
অথ তু বেৎসি শুচি ব্রতমাত্মনঃ
পতিকুলে তব দাস্যমপি ক্ষমম্।।"[২২] (৫/৩০)

শার্ঙ্গরবের উক্তি থেকেই সহজে বোঝা যায় যে (গান্ধর্ব) বিবাহোত্তর কালে তার স্বাতন্ত্র্য খর্বিত হয়েছে এবং স্বামীর থেকে লাঞ্ছিত হওয়ার পরেও স্ত্রীধর্মানুসারে তার দাসীবৃত্তি করাই শ্রেয়; কারণ সে কুলের কলঙ্কভাজন হওয়ায় মহর্ষি কণ্বের কোনো সাত্ত্বিক কার্যে তার সহায়তার প্রয়োজনও থাকবেনা। তাই একদিকে স্বামীপরিত্যক্তা এবং অন্যদিকে তার সহ-আশ্রমিকদের তার প্রতি অনীহাপ্রকাশে সে বলতে বাধ্য হয় "ভগবতি বসুধে, দেহি মে বিবরম্।"[২৩] কোনো নারী যখন সম্পূর্ণতঃ সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়ে, তখনই ধরিত্রীকে বিদীর্ণ হতে অনুনয় প্রকাশ করে। ঠিক তারই পরে নেপথ্যে একটি অত্যাশ্চর্যমূলক ঘটনা ঘটে এবং কুলপুরোহিতের থেকে পাঠক বা সহৃদয় দর্শক জানতে পারে যে কোনো এক সুরপ্রভাসজ্জিতা জ্যোতির্ময়ী অঙ্গনা শকুন্তলাকে আকাশমার্গে নিয়ে চলে যায় যখন শকুন্তলা ভাগ্যবিড়ম্বিতা হয়ে ক্রন্দনরত চিত্তে বিবশা হয়ে পড়েছিল –

"দেব, পরাবৃত্তেষু কণ্বশিষ্যেষু
সা নিন্দন্তী স্বানি ভাগ্যানি বালা
বাহূৎক্ষেপং ক্রন্দিতুং চ প্রবৃত্তা।
স্ত্রীসংস্থানং চাপ্সরতীর্থমারাদুৎথাপৈনাং জ্যোতিরেকং জগাম।।"[২৪] (৫/৩৩)

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে শকুন্তলার চরিত্রটি যেভাবে লিখিত হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে শকুন্তলার মধ্যে দুষ্যন্তজনিত উৎকণ্ঠা এবং বিপ্রলম্ভাত্মক রতির অভিব্যক্তি। প্রথম অঙ্কে সে সলজ্জ ভঙ্গিমায় নাট্যপরিসরে আবির্ভূত। আশ্রমবৃক্ষে জলসেচনাদি নিত্যকর্মে সে অভ্যস্ত। সেই নিস্তরঙ্গ জীবনে সহসা রাজা দুষ্যন্তের প্রবেশ। রাজা ও শকুন্তলা উভয়েই অনুরক্ত হয় যা পূর্ণতঃ উন্মেষিত হয় তৃতীয় অঙ্কে। সেখানেও শকুন্তলার চরিত্রটি আবর্তিত হয়েছে নায়ক দুষ্যন্তকে কেন্দ্র ক'রেই। এরপর চতুর্থ অঙ্কে বোঝা যায় তার নিসর্গপ্রেমের আবিলতা। চেতন-অচেতনের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাট্যকার অসাধারণ প্রতিভায় ব্যক্ত করেছেন। তাই বনজ্যোৎস্না, আশ্রমমৃগ সকলেই শকুন্তলার বিদায়ে ব্যথিত ও মথিত হয়েছে। পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলা দুষ্যন্তকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েও মঞ্চে সময়ব্যয় করেনি। এরপর শেষ বা সপ্তম অঙ্কে তার দুষ্যন্তের সঙ্গে মিলনকালে সে একজন জননীসুলভ নারীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই কালিদাসের রচনাভণিতি তাকে একমাত্রিক ক'রে তুলেছে। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা-ই নায়িকা শকুন্তলার লক্ষ্য। অন্যদিকে দুষ্যন্ত ষষ্ঠ অঙ্কে স্ত্রীর জন্য বিলাপ করেছে। কালিদাসের নাট্যরচনায় শকুন্তলা তার জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে অবগত ছিল কিনা সে বিষয়েও কোনো মন্তব্য করেননি কালিদাস। তাহলে এক্ষেত্রে সন্ধিৎসু পাঠকের জিজ্ঞাসা থাকতে পারে যে সেলিম-আল-দীন শকুন্তলার চরিত্রবর্ণনায় কতখানি প্রাচীনতার অবলম্বন করেছেন এবং তা কীভাবে বজায় রেখেছেন। তাহলে এখানে বলতে হয় যে তিনি যেভাবে মহাকবির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তা হল শকুন্তলার চরিত্রের আন্তরিক সৌকুমার্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পূর্বোক্ত 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে বলেছেন –

> "কালিদাস তাঁহার এই আশ্রমপালিতা উদ্ভিন্নযৌবনা শকুন্তলাকে সংশয়-বিরহিত স্বভাবের পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন, শেষ পর্যন্ত কোথাও তাহাকে বাধা দেন নাই। আবার অন্য দিকে তাহাকে অপ্রগলভা, দুঃখশীলা, নিয়মচারিণী, সতীধর্মের আদর্শরূপিণী করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।"[২৫]

সেকথারই প্রতিফলন দেখা যায় এই শকুন্তলা দৃশ্যকাব্যে। যখন শকুন্তলা জানতে পারে তার প্রকৃত জননী অপ্সরা মেনকা, তখনই তার মধ্যে থাকা স্বর্গ-মর্ত্য তথা বদ্ধতা-মুক্ততার দ্বন্দ্ব নাট্যকে অধিকতর নাট্যায়িত করে তুলেছে। শকুন্তলা বলে –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "মা বলেছেন শুদ্ধ হও মেয়ে। এইসব নোংরা শরীর ফেলে চলে এসো। মা আমি আজ ধূপ জ্বালবো – পায়ে পরবো সোনার নূপুর। মানুষ – মানুষ। ছি ঘেন্না। তারা এক পেট বমি নিয়ে স্বর্গের গান করে। আমি এই নখে কুয়াশা মেখে সাঁঝের আকাশ দেখবো। আমার নাচে নদী চলে আসবে ভুল পথে।"[২৬]

অর্থাৎ এই দৃশ্যকাব্যের 'স্বর্গীয় ষড়যন্ত্র' খণ্ডভাগে যে কামলোলুপতার প্রসঙ্গ এসেছিল, তা হ'ল আত্মরতিবিলাস এবং 'শকুন্তলা' খণ্ডভাগ প্রমাণ করে যে শকুন্তলা একজন রঙ্গোপজীবিনী অপ্সরার কন্যা হয়েও সে বাসনাকে করতে পারে রিক্ত। তাই কালিদাসের নাটকে যে সত্য কথিত হয়েছে পাঠকসম্মুখে, সেই সত্যই পুনরায় উত্থাপিত হয়েছে সেলিম-আল-দীনের মাধ্যমে। দুষ্যন্তের সঙ্গে তার পরিচয় এবং তদাবস্থায় তার মধ্যে অনুরণিত হয়েছে কাম এবং যখন দুর্বাসার অভিশাপে স্বামীর সঙ্গে ক্ষণিক বিচ্ছেদে বিরহের জ্বালা তাকে দগ্ধ করেছে, তখনই সে হয়েছে শুদ্ধ। তখন দুষ্যন্তের প্রতি জাগ্রত হয়েছে তার প্রেমসত্তা। এভাবে শকুন্তলার চিত্তের শুদ্ধীকরণ যেমন মহাকবির বৈদগ্ধ্যে আলোকিত হয়েছে, তেমনই আধুনিক সময়ের বাংলাদেশের নাট্যকার সেলিম-আল-দীনের *শকুন্তলা*-ও সেই ভাবকে পরিমিতিজ্ঞানেই ব্যক্ত করেছেন এবং সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন দৃশ্যকাব্যের।

অনুভবে ও অভিনবত্বে শকুন্তলা : কালিদাসের স্নিগ্ধ ছায়াতলে যত সাহিত্যিক-ই আশ্রয় নিয়েছেন, তাদের সেই আশ্রয়টি নিজস্ব আলয় হয়ে উঠেছে কিনা তার ভাবনা প্রয়োজন। রবীন্দ্রবচনকে অনুসরণ করলে দেখতে হবে যে সেই সৌন্দর্য এবং সংযমের মিশেল ক'তখানি ঘটেছে। 'অনুভব' অর্থাৎ যা ছিল নির্বাক, তা-ই হ'ল সবাক। অন্যদিকে 'অভিনবত্ব' তখনই আসে যা সম্পূর্ণতঃ আধুনিক সাহিত্যিকগণের ভাষার সৌজন্যে নতুনের প্রাপ্তি। প্রথমটি কোনও এক রূপ থেকে অপরূপের দিকে যাত্রা এবং দ্বিতীয়টি রূপের মধ্যেই অপরূপের সন্ধান। *বীরাঙ্গনা* কাব্যটিকে প্রথম প্রকারে সামিল হতে পারে। সেখানে শকুন্তলার গহীন মনের অস্ফুট বাক্যকেই কবি প্রস্ফুটিত ক'রে তুলেছেন। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার এহেন স্বগতোক্তি সংযোজিত হলেও মূল নাট্যক্রিয়ায় কোনও পরিবর্তন হবে না। তাই এটি আশ্রয় পর্যায়েই রয়ে গেছে। অযথা ভাবগম্ভীর কোনও নাট্যীয় উপাদান যুক্ত করেননি। ফলে এখানে শকুন্তলার মধ্যে কেবলই কামের তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়েছে যা অনুপম কাব্যিক হলেও কালিদাসের দর্শন উঠে আসেনি। বহ্নিপতঙ্গ গল্পটির সঙ্গে *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের সম্পর্ক সমানুপাতিক। দুইয়ের মধ্যে বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাব বর্তমান। তাই এখানেও মূল নাটকের কোনও ভাবান্তর ঘটছে না। এখানে ফুল ও ফলের অপার্থিব সৌন্দর্যের আস্বাদ অনুভাবিত করে। কীভাবে একটি প্রাচীন সাহিত্য বর্তমানের যুগেও একই চেতনা উদ্রিক্ত করে, তার জন্য এই গল্প এক আদর্শ উদাহরণ। 'ভরতের ঝুমঝুমি' এক অভিনব সৃষ্টিচাতুর্য। সেখানে মূল গল্পটির কাঠামো তদ্বৎ রয়ে গেলেও তদ্ভব এক আধুনিক বা সমকালীন ভাবনার উদ্রেক ঘটিয়েছে। কোনও এক অংশবিশেষ যে একটি সমগ্র চিত্রপট রচনা করতে পারে, তা দেখিয়েছেন পরশুরাম। এখানে গল্পকারের কালিদাসের বার্তাকে তুলে ধরার কোনও প্রয়াস ছিল না। এমনকি তার প্রয়োজনও থাকেনি। তাই গল্পটি তার নিজস্ব সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। সবশেষে আসে *শকুন্তলা* দৃশ্যকাব্যের কথা। সাহিত্য সংরূপের দিক থেকে এর সঙ্গে *অভিজ্ঞানশাকুন্তল*-এর ভেদ নেই। দুটিই দর্শনযোগ্য নাট্য রচনা। এখানে নারীদের জীবনে ঘটা বিভিন্ন প্রতিকূলতার কথাই উঠে এসেছে। স্বর্গ ও মর্ত্যের মেলবন্ধন ঘটেছে তবে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ও বিশ্ব মানবতার প্রীতির মধ্যে কোনটি উত্তম, তার বিচারের অবকাশ থাকেনি। এই দৃশ্যকাব্য শকুন্তলার মায়াময় ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে পরে তা নিজের ঠিকানা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। তাই আধুনিক যুগের এই চারটি সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পরে একথাই বলতে হয় যে 'বহ্নি-পতঙ্গ' গল্পটিই নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার পরম ফল। নতুন প্রেক্ষাপটে এবং নতুন প্রেক্ষিতে এক অনির্বচনীয় দার্শনিক বোধসম্পন্ন সাহিত্যের সৃজন হয়েছে। কালিদাসের *অভিজ্ঞানশাকুন্তল*-কে বলা হয় নাট্য সাহিত্যের মধ্যে অতি রমণীয় এক নাট্যগ্রন্থ। তাই সেই নাটককে কেন্দ্র করে কখনও গল্প, কখনও উপন্যাস, কখনও কাব্য, কখনও দৃশ্যকাব্য বা কখনও প্রবন্ধ লেখার চর্চা যেমন অব্যাহত, তেমনই প্রতিটি সাহিত্যই রসোত্তীর্ণ।

Reference:

১. *মহাভারতম্ : আদিপর্ব্ব*. হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (অনু.), কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : সিদ্ধান্তবিদ্যালয়, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৬৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২. Winternitz, M. *History of Indian Literature : Vol III*, Delhi : Motilal Baranasidass, 1967, PP. 237-238
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *প্রাচীন সাহিত্য*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪
৪. তদেব, পৃ. ৩৫-৩৬
৫. দত্ত, মধুসূদন. *বীরাঙ্গনা কাব্য*, কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বউবাজার ১২৭ নং ভবনের ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে যান্ত্রিত, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩-৪
৬. তদেব, পৃ. ৩
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু. *ব্যোমকেশ সমগ্র*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫, পৃ. ৬২০
৮. তদেব, পৃ. ৫১৩
৯. তত্রৈব
১০. কালিদাস. *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*. হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (অনু.), কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়, ১৮৬০ শকাব্দ, পৃ. ৩১
১১. বসু, রাজশেখর. *ধুস্তরী মায়া ইত্যাদি গল্প*, কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : এম সি সরকার অ্যান্ড সনস্ প্রাইভেট লিঃ, (প্রকাশকাল অপ্রাপ্ত), পৃ. ৪০-৪১
১২. কালিদাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬
১৩. আল-দীন, সেলিম, *সেলিম আল দীন নাটকসমগ্র ১*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩, পৃ. ৪১০
১৪. কালিদাস. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮
১৫. তদেব, পৃ. ২৩
১৬. আল-দীন, সেলিম. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৮
১৭. কালিদাস. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩
১৮. তদেব, পৃ. ৩৬
১৯. তত্রৈব
২০. আল-দীন, সেলিম. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১০
২১. তদেব, পৃ. ৪১১
২২. কালিদাস. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪-৪১৫
২৩. তদেব, পৃ. ৪২০
২৪. তদেব, পৃ. ৪২১
২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
২৬. আল-দীন, সেলিম. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১২